# নবজাতক কেন কেঁদে উঠে

*পরিবারের সবার জন্য বয়ে আনে অজস্র আনন্দ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সন্তানের কান্নার ধ্বনি শুনে মায়ের চোখের কোণে জল। মায়ের কান্না মিশ্রিত হাস্যজ্জ্বল মুখখানা দেখে সবাই আনন্দে কান্না করে। নিশ্চয়ই নবজাতকের কান্নার পিছনে রয়েছে বিশেষ কারণ। নবজাতক শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কেন কেঁদে ওঠে তা জানাবো এবারের আয়োজনে।*

স্বাভাবিকভাবে মাথায় এই প্রশ্নটা আসে সকলের, একটা নবজাতক পৃথিবীতে আসার পর কেন কেঁদে ওঠে? প্রায় প্রতিটি শিশু জন্মের পর কাঁদে। আবার কখনো কাঁদতে বাধ্য করা হয়। যে শিশু নিজে কাঁদে না তাকে পিঠে থাপ্পড় দিয়ে কাঁদানোর চেষ্টা করেন চিকিৎসকেরা। নবজাতক কান্নার মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমনের বার্তা দেয়। সিনেমার পর্দায় এমন দৃশ্য তো অজস্রবার দেখেছি আমরা। পৃথিবীতে কান্না হচ্ছে দুঃখ-কষ্টের প্রতীক। কিন্তু জন্মের পর শিশুর প্রথম কান্না হয় সুখকর।

## শিশুর কান্নার মূল কারণ

মায়ের গর্ভে থাকার সময় শিশু মায়ের কাছ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে থাকে। জন্মের আগ পর্যন্ত শিশু মায়ের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত আম্বিলিক্যাল কর্ড বা নাভিরজ্জুর মধ্য দিয়ে শ্বাস নেয়। জন্মের পর শিশু নিজে থেকেই শ্বাস নেওয়া শুরু করে। তখন শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। শিশু আচমকা এরকম দম বন্ধ করা পরিবেশে এসে কষ্টে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। আর এই কান্নার ফলে পরিষ্কার হয়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ। শিশু তখন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারে। পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হয়ে চলতে থাকে হৃদপিণ্ড। মূলত এই কারণেই শিশু কান্না করতে শুরু করে পৃথিবীতে আসার পর।

## শ্বাস নেওয়ার সময়েই কেঁদে ওঠে শিশু

মায়ের গর্ভে শিশুর দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন আসে প্লাসেন্টা ও নাড়ির মাধ্যমে। অমরা হচ্ছে গর্ভফুল। এটি গর্ভাশয়ের ভেতরেই থাকে। এখান থেকেই মায়ের দেহে তৈরি হয় ডিম্বক। বিশেষ এই অঙ্গটি মায়ের দেহ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফিল্টার করে নাড়ির মাধ্যমে শিশুর দেহে পাঠায়। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর আলাদা করে শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো কাজ করতে হয় না। শিশুর নবগঠিত ফুসফুস তখন থাকে তরলে পূর্ণ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই শিশুটি নিজেকে আবিষ্কার করে ঠান্ডা, শুষ্ক ও উজ্জ্বল পরিবেশে। এই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য প্রথমবারের মতো তার শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক জন্মের সময় শিশু একটা চাপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসে। ফলে ফুসফুসে থাকা তরল বেরিয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে প্রথমবারের মতো শ্বাস নেয়। এই শ্বাস নেওয়ার সময়েই কেঁদে ওঠে শিশু।

## শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ আটকে যায়

নবজাতক শিশু যখন গর্ভের বাইরে আসে তখন হৃদপিণ্ডের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ শরীরের বিভিন্ন ফ্লুইড নিঃসরণের কারণে আটকে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে শিশু চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। কান্নার মাধ্যমেই শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ পরিষ্কার হয়। আস্তে আস্তে শিশু স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে শুরু করে। নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তখন।

## হার্ট ও ফুসফুস সঠিকভাবে কাজ করছে

শিশু মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠে। মায়ের গর্ভ জায়গাটি পৃথিবীর মতো নয়। সেখানে উষ্ণ, তরল পরিবেশ থাকে শিশুর চারপাশে। খাবার বা বেড়ে

ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিয়েও নিজের কোনো ভাবনা নেই তার। নেই অক্সিজেনের জন্য কোনো চিন্তা। সবই সে পায় মায়ের শরীর থেকে। মায়ের গর্ভ থেকে যখন শিশু পৃথিবীতে আসে তখন সে মায়ের গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে শিশু যদি জন্মের পরপরই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে তবে বোঝা যায় তার হার্ট ও ফুসফুস সঠিকভাবে কাজ করছে। নবজাতকের হার্ট ও ফুসফুস সঠিকভাবে কাজ করছে বোঝা যাবে শিশু কান্না করলে।

## নবজাতকের কান্নায় পানি থাকে না

নবজাতকরা কাঁদলে চোখ দিয়ে তেমন পানি ঝরে না। জন্মের পর পর শিশুদের অশ্রুগ্রন্থি সচল হয় না। ফলে কাঁদলেও অশ্রু গড়ায় না চোখ দিয়ে। শিশু জন্মের প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায় কান্নার গ্রন্থি তৈরি হতে। তাই তারা কাঁদে না। মূলত শিশু চিৎকার করে। আমরা ভাবি শিশুটা কাঁদছে। কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু শিশু প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস পরে কাঁদে।

## মায়ের গলার আওয়াজ বুঝতে পারে নবজাতক

পৃথিবীতে আসার পর নবজাতক শিশু তার মায়ের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে। কান্নার মাঝেও মায়ের কথা শোনে এবং এতে সাড়া দিয়ে থাকে নানাভাবে। বিভিন্ন ভঙ্গিমা করে বুঝায় এটা তার মা। শিশুরা মায়ের কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে খুব স্পর্শকাতর হয়। মায়ের ডাকে সাড়া দেয় না এমন ঘটনা খুবই বিরল। মায়ের ডাকে মধুর ছোঁয়া রয়েছে।

## কান্নার সঙ্গে স্বাস্থ্যের যোগসূত্র রয়েছে

শিশুর কান্নার বেশকিছু প্রকার রয়েছে। একেকটা কান্না একেকরকম ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। শিশুর কান্না দেখে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। উচ্চস্বরে কাঁদলে তারা বুঝতে পারেন শিশু পুরোপুরি সুস্থ। তবে শিশুটি যদি খুব ধীর গলায় কান্নাকাটি করে, তাহলে স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ডাক্তারের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও শিশুর কান্নার ধরন লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

## দৈনিক কত ঘণ্টা কাঁদে একজন শিশু

জন্মের পর একজন সুস্থ্য শিশুর ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা কাঁদা উচিত। গবেষণা থেকে জানা যায় এই তথ্য। তবে যদি শিশু চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কান্নাকাটি করে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। শিশু যত বড় হবে তত তার কান্নার পরিমাণও কমতে শুরু করে।

## নবজাতক মায়ের জীবন বাঁচায়

একজন মা যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতির সমস্যায় ভোগে তাহলে মায়ের পেটে থাকা শিশুটি সেই ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে পারে তার স্টিম কোষ বদলের মাধ্যমে। অর্ধেকের বেশি নারী যাদের হার্ট দুর্বল হওয়ার সমস্যা রয়েছে, তাদের হার্ট ভালো হয়ে যায় গর্ভাবস্থায় বা গর্ভপরবর্তী সময়ে। বলাই যায় কাঁদতে কাঁদতে পৃথিবীতে আসা একজন শিশু মায়ের জীবন বাঁচিয়ে দেয়।

## হাড় বেশি থাকে নবজাতকের

পৃথিবীতে জন্মের পর নবজাতকের শরীরে প্রায় ৩০০ হাড় থাকে। আসলেই এটা সত্যি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় অত্যধিক বেশি। ছোট ছোট এসব হাড় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একত্র হয়ে গঠিত হয় বড় হাড়। জন্মের সময় শিশুর মাথায় বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলো হাড় থাকে। দুই বছর বয়সে এগুলো সব একত্রিত হয়ে তৈরি হয় শক্ত খুলি।

## মেয়ে শিশুর ডায়াপারে রক্ত কেন

গর্ভে থাকা অবস্থায় একজন শিশু মায়ের শরীরের উচ্চ মাত্রায় ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবের আওতায় থাকে। জন্মের পর তাদের শরীরে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ দ্রুত কমে আসে। এই কারণে মেয়ে নবজাতকের মাঝে দেখা যেতে পারে সিউডো মেন্সট্রুয়েশন। যার কারণে মাঝে মাঝে দুই-এক ফোঁটা রক্ত শিশুর ডায়াপারে দেখা যেতে পারে। জন্মের প্রথম এক সপ্তাহের মাঝে মোটামুটি ২৫ শতাংশ শিশুর ডায়াপারে রক্ত দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এটাকে ‘pseudo-menstruation’ বা ‘ছদ্ম মাসিক’ বলা হয়ে থাকে। নবজাতক মেয়ে শিশুর জরায়ু দিয়ে এই রক্ত বের হওয়াটা কিছুটা মাসিকের মতো মনে হলেও এটা আসলে মাসিক-সংক্রান্ত নয়।

## ডায়াপার নোংরা হলে শিশুরা কাঁদে

কিছু শিশু ডায়াপার নোংরা হলেই অস্বস্তি প্রকাশ করে ও কাঁদে। আবার কিছু শিশু এটা অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারে। তবে ডায়াপার নোংরা হলেই তা তৎক্ষণাৎ পাল্টানো উচিত। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে শিশুর ডায়াপারের দিকে। ডায়াপার ব্যবহার করার সময় ভিজে যায় কিন্তু খেয়াল করা হয় না। যার কারণেও বাচ্চা কান্না করতে পারে। তাই ডায়াপার যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো।